জুম্ম সংবাদ বুলেটিন

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

বুলেটিন নং ১০, রবিবার, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩

(২য় বর্ষপূর্তি সংখ্যা)

সম্পাদকীয়

জুম্ম সংবাদ বুলেটিন, দু'বছরের পথ পরিক্রমার শেষে তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করতে যাচ্ছে। সময়ের সাথে তাল রেখে চলতে না পারলেও বুলেটিনের ১০টি সংখ্যা এ সময়ে আত্মপ্রকাশ করেছে জুম্ম জনগণের কোন বিশেষ সমস্যা বা ঘটনাকে পরিচিহ্নিত করে।

আন্দোলনের অত্যন্ত রূঢ় বাস্তবতার মধ্যে যেমন বুলেটিনের আত্মপ্রকাশ, তেমনি অত্যন্ত বন্ধুর ও বিচ্ছিন্ন পথে থেমে থেমে বুলেটিনের অগ্রযাত্রা। তাই সর্বাগ্রে অকপটে স্বীকার করতে হয়; পার্বত্য চট্টগ্রামের হাজারো ঘটনার বা বিষয়ের সবগুলো জনসমক্ষে তুলে ধরতে বুলেটিন সক্ষম হয়নি। প্রকাশিত ১০টি সংখ্যার ক্ষুদ্র পরিসরে গুটিকয়েক ঘটনা বা বিষয় তুলে ধরা হয়েছে মাত্র। আর এটাও স্বীকার্য্য যে, জুম্ম জনগণের উপর মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে জুম্ম সংবাদ বুলেটিন যত না প্রচার করতে সক্ষম হয়েছে তার চেয়ে বেশী প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বের মানবতাবাদী সংস্থা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক বিদেশী সংস্থাসমূহের বুলেটিন, বুকলেট, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, আন্তর্জাতিক সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধে ও বিদেশী সাময়িকী এবং পত্র-পত্রিকায়। জুম্ম জনগণ ও জনসংহতি সমিতি এসব প্রকাশনায় নিয়োজিত সংস্থা বা ব্যক্তিত্বের নিকট চির কৃতজ্ঞতাবদ্ধ থাকবে।

এটা অবধারিত যে, বাংলাদেশ সরকারের আন্দোলন বিরোধী অপপ্রচারণা, বানোয়াট ও বিকৃত খবরের পরিবেশন, জুম্ম জনগণের উপর মানবাধিকার লংঘনের সঠিক খবরাখবর প্রকাশনার উপর সেন্সরশীপ প্রভৃতি জুম্ম সংবাদ বুলেটিনের প্রচারণায় অনেক অন্তরায় ঘটিয়েছে। বিশেষ করে সরকার নিয়ন্ত্রিত থানা সদর ও গ্রামগুলোতে জুম্ম সংবাদ বুলেটিন প্রচারণা অত্যন্ত সীমিত পর্য্যায়ে থেকেছে। কিন্তু তা সত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে ও ইউনিটে কর্মরত দলীয় সদস্য, দেশ বিদেশের সমর্থক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের আন্তরিক সহযোগিতায় বুলেটিনের প্রচারণার বিস্তৃতি ঘটেছে। দেশ-বিদেশের এসব কর্মী, সমর্থক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জুম্ম সংবাদ বুলেটিন বিগত দু'বছরের প্রকাশনায় অনিবার্য কারণে বিষয়গত উপস্থাপনা, তথ্য প্রকাশনা ও বিষয় সজ্জা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনেক অসংগতি ও ত্রুটি ঘটেছে। এক্ষেত্রে হৃদয়বান পাঠক সমাজের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি আমাদের কাম্য। আর প্রকাশনার সীমিত পরিসর হেতু অনেকের পাঠানো প্রবন্ধ, কবিতা, ছোট গল্প প্রভৃতি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি বলে আমরা দুঃখিত।

পরিশেষে প্রকাশনায় দু'বছরের বিভিন্ন তথ্য ও সংবাদ প্রেরণ, আর্থিক সহায়তা প্রদান ও প্রকাশনার উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও গঠনমূলক মতামতের জন্য কর্মীবাহিনী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। আন্দোলনের পটভূমি, বাস্তবতা, যৌক্তিকতা ও ঘটনা প্রবাহ যথাযথভাবে তুলে ধরে সরকারের অপপ্রচারের খণ্ডন ও হীন মুখোশ উন্মোচনের অঙ্গীকার নিয়ে বুলেটিনের অগ্রসরতা আরো গতিময় হোক এটা আমাদের কাম্য।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন ও বাস্তবতা

শ্রী জগদীশ

জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের সমস্যার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন বিষয়টি আজ ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। বিশেষতঃ বাংলাদেশ সরকারের সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা, বৃহত্তর জুম্ম স্বার্থ বিরোধী সরকারী লেজুড়, চুলা ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী, সরকারী গুণকীর্তনকারী একশ্রেণীর সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক ও লেখক সবাই পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে এই উন্নয়ন উপমায় প্রলিপ্ত করতে সদা উদ্যত। তাদের কপটকটু বক্তৃতায়, আলোচনায় ও প্রবন্ধে-নিবন্ধে দেখা যায় যে, পার্বত্যাঞ্চলের উন্নতি আকাশ ছুঁয়ে গেছে। পার্বত্যাঞ্চলের অনুর্বর পাহাড়ের গাঁয়ে সোনার হরিণ বাসা বেঁধেছে, অরণ্য বনভূমিতে সোনার পাখী গান ধরেছে, ছোট ঝর্ণার স্রোতে সোনার কাঁকড় ভেসে যাচ্ছে, গিরিখাদ সোনাদানায় ভরে উঠেছে যেন সারা পার্বত্যাঞ্চল সোনার উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে। দেশ-বিদেশের পর্যবেক্ষক-মহলের দৃষ্টিও যেন এই উন্নয়নের আলোকচ্ছটায় ঝাঁপসা হয়ে আসছে। বক্ষ্যমান নিবন্ধে এই উন্নয়নে অবগাহন করে এর গভীরতা ও বাস্তবতা নির্ণয় করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের ভাষ্যে দেখা যায় যে, প্রাক্তন পাকিস্তান আমলে পার্বত্যাঞ্চল ছিল সব দিক থেকে অবহেলিত। তাই স্বাভাবিকভাবে এ অঞ্চল রয়ে যায় পশ্চাদপদ ও অনুন্নত। কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সাথে সাথে পার্বত্যাঞ্চলে উন্নয়নের জোয়ার এসে পড়ে। বিশেষত ৭০ দশকের শেষে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান উন্নয়নের জোয়ারে ভেসে দেন পার্বত্যাঞ্চলকে। তিনি ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। সেই থেকে পার্বত্যাঞ্চল ধাপে ধাপে এগিয়ে চলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির পথে যার গতি এখনো সমভাবে বহমান। পার্বত্যবাসী জুম্মদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য গৃহীত হয় কোটি কোটি টাকার উন্নয়ন কর্মসূচী। এ কর্মসূচীতে রয়েছে—উচ্চভূমি বন্দোবস্তিকরণ, রাবার বাগান প্রকল্প, বন ও উদ্যান সৃষ্টি, জুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্প—বহুগ্রাম, মৌথ-খামার ও গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠা, ছাত্রাবাস, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, উপাসনালয় নির্মাণ, বিদ্যুতায়ন, টেলি-যোগাযোগ, কুটির ও গ্রামীণ শিল্প উন্নয়ন, উপজাতীয় সংস্কৃতির উন্নয়ন ও মুরুং কমপ্লেকস্ ইত্যাদি। আর উন্নয়নের এই গতিকে আরো ত্বরান্বিত করার জন্য গৃহীত হয় শত শত কিলোমিটার পাকা রাস্তা নির্মাণ কর্মসূচী। সরকারী হিসেবে দেখা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ১৯৭৬—৯০ সালের মধ্যে ব্যয় করেছে ৪৫৬ কোটি টাকা। এই বোর্ডের সরাসরি তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচীগুলো হচ্ছে:

(ক) নরম্যাল বোর্ড কর্মসূচী।

(খ) ইউনিসেফ সাহায্যপুষ্ট সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচী।

(গ) এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক সাহায্যপুষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প বহুমুখী।

(ঘ) বিশেষ পঞ্চ বার্ষিকী (১৯৮৪-৮৫—১৯৮৯-৯০) পরিকল্পনায় ২৬৩ কোটি টাকার প্রকল্প।

আরো উল্লেখ্য যে, এই উন্নয়ন বোর্ডের গৃহীত প্রকল্পের পাশাপাশি পার্বত্যাঞ্চলে ইউনিয়ন, উপজেলা, পৌরসভা ও জেলা পর্যায়ে অনেক উন্নয়ন বরাদ্দ দেয়া হয়। এ সবের মধ্যে রয়েছে খয়রাতি সাহায্য, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচী এবং স্থানীয় সরকার পরিষদ ও জেলা প্রশাসনের অন্যান্য বরাদ্দ। তাছাড়া রয়েছে কোটি কোটি টাকার সরকারের শান্তকরণ (প্যাসিফিকেশন) কর্মসূচী। বিগত ১৫ বৎসরে পার্বত্য চট্টগ্রাম—উন্নয়ন বরাদ্দের সবগুলো খাতের ব্যয়ের পরিমাণ ইতিমধ্যে ১৫,০০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে (প্রসঙ্গ পার্বত্য চট্টগ্রাম—এখনো ষড়যন্ত্র——১৫)। পার্বত্যাঞ্চলের উন্নয়ন বরাদ্দে এই ব্যয় অভাবনীয়। তাই পার্বত্যাঞ্চল আজ উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছে।

বাংলাদেশ সরকারের উপরোক্ত উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে পার্বত্যাঞ্চলের শিক্ষা, সড়ক, বিদ্যুৎ, টেলিফোন ও স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়নের ফিরিস্তি নিম্নে দেয়া গেল ...

খাত	১৯৪৭	১৯৯১
কলেজ	—	৯টি (৩টি সরকারী)
মাধ্যমিক স্কুল	১	৬২টি
জুনিয়র হাই স্কুল	—	৩৩টি

খাত	১৯৪৭	১৯৯১
প্রাথমিক স্কুল	২০	৯৩৮টি
উপজাতীয় ছাত্রাবাস	—	৯টি
রেসিডেন্সিয়েল স্কুল	—	২টি (ছাত্রাবাসসহ)
শিক্ষিতের হার	২-৩%	২০% (চাকমা—৫৬%)

	১৯৭৫	১৯৯১
সড়ক যোগাযোগ	৭২ কিঃ মিঃ	৭৫২·২৬ কিলোমিটার
বিদ্যুৎ	রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান	সকল উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে
টেলিফোন	জেলা সদর পর্যন্ত	সকল জেলা ও উপজেলা সদর পর্যন্ত
স্বাস্থ্য	রাঙ্গামাটিতে ৩১ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল	রাঙ্গামাটিতে—১০০ শয্যা বিশিষ্ট ১টি খাগড়াছড়িতে— ৫০ ” ” ১টি ৬টি উপজেলা সদরে ৩১ ” ” ৬টি প্রতি উপজেলার স্বাস্থ্য প্রকল্প

উপরোক্ত পরিসংখ্যানটি পার্বত্যাঞ্চলের উন্নয়নের এক চূড়ান্ত দিক নির্দেশ করে। বিশেষতঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে জুম্মদের অগ্রগতি অভাবনীয়। এই অগ্রগতি দেখে মনে হয় পার্বত্যাঞ্চলের জুম্ম জনগণ পশ্চিমা উন্নত দেশসমূহের সমপর্যায়ে অগ্রগতি লাভ করেছে। সড়ক ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের অগ্রগতিও অনুরূপ অবস্থা নির্দেশ করে। কিন্তু বাস্তবে কি জুম্ম জনগণ এত অগ্রগতি লাভ করেছে? এবারে সেই উন্নয়ন বা অগ্রগতির বাস্তব মূল্যায়ন করা যাক।

শিক্ষা ঃ— পরিসংখ্যানে প্রদত্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে জুম্ম জনগণের অগ্রগতির নির্দেশক নয়। যেহেতু পার্বত্যাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থা পর্যালোচনা করলে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। পার্বত্যাঞ্চলের ৯টি কলেজের মধ্যে ৩টি সরকারী কলেজের সব সুযোগ সুবিধা প্রধানত বাঙ্গালীরা ভোগ করছে। এ সব কলেজে নিয়োজিত শিক্ষকদের মধ্যে ৭/৮ জন জুম্ম শিক্ষক ছাড়া বাকীরা সবাই বাঙ্গালী এবং ৫০% ভাগ ছাত্রছাত্রীই বাঙ্গালী ব্যবসায়ী ও সরকারী কর্মকর্তার ছেলেমেয়ে। বাকী ৬টি কলেজের মধ্যে দিঘীনালা কলেজটি প্রতিষ্ঠা বছর ১৯৮৬ সালে বন্ধ হয়ে গেছে এবং রাঙ্গামাটি নৈশ কলেজটিও তথৈবচ। আর রামগড় ও কর্ণফুলী কলেজ সম্পূর্ণ বাঙ্গালী ছাত্রছাত্রীদের জন্য এবং অবশিষ্টগুলি নাম সর্বস্ব কলেজ। সেগুলোতে না আছে শিক্ষক না আছে ছাত্রছাত্রী। মাধ্যমিক স্কুলের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা বিরাজমান। শহরাঞ্চলে অজুম্ম ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাই বেশী। প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুলগুলি জুম্ম প্রধান হলেও এগুলো খোলস সর্বস্ব স্কুল ছাড়া আর কিছুই নয়। এগুলো বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত এবং জুম্মদের প্রচেষ্টায় কোন রকমে অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। এগুলোতে সরকারী অনুদান যৎসামান্য। পরিসংখ্যানে প্রদত্ত জুনিয়র হাই স্কুলগুলো বাস্তবে অনুপস্থিত ও প্রধানত অনুপ্রবেশকারীদের অঞ্চলে কয়েকটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা বেশী হলেও কার্যত স্কুলের সংখ্যা অর্ধেকের কম হবে। যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রামের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি, কাপ্তাই-শান্তিগ্রাম প্রতিষ্ঠা, ভারতে শরণার্থী গমন প্রভৃতি কারণে খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষ্মীছড়ি, মাটিরাঙ্গা, পানছড়ি ও দিঘীনালা থানার প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিকাংশ প্রাইমারী স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। তাছাড়া অনেক প্রাইমারী স্কুলকে সামরিক ছাউনিতে পরিণত করা হয়েছে। আরো পরিহাসের বিষয় যে, ৮০ দশকের প্রথম দিকে সকল প্রাইমারী স্কুলের জুম্ম শিক্ষক/শিক্ষিকাকে স্থানীয় সামরিক ক্যাম্প কমান্ডারের ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট নিয়ে মাসিক বেতন তুলতে হতো। বর্তমানেও অনেক অঞ্চলে এব্যবস্থা কার্যকরী রয়েছে। কার্যত স্কুলের মধ্যে আবার অর্ধেক স্কুল অজুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলে অবস্থিত। ফলে পরিসংখ্যানে প্রদত্ত বিভিন্ন স্কুলের সংখ্যা বেশী হলেও পার্বত্য

চট্টগ্রামের শিক্ষার হার অত্যন্ত নিম্ন। বান্দরবান জেলার মুরুং, খুমী, বনযোগী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের শিক্ষার হার নেই বললেই চলে। চাকমাদের তুলনায় মারমা ও ত্রিপুরাদের শিক্ষার হারও নিম্ন। শিক্ষার ক্ষেত্রে এহেন অবস্থায় কি বলা যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সব সুযোগ সুবিধা জুম্ম জনগণ ভোগ করছে ? অজুম্মরা নয় ?

টেলিফোন :—পার্বত্যাঞ্চলের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আজ টেলিফোন যোগাযোগ সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন জাগে কারা এই টেলিফোন যোগাযোগের সুবিধা ভোগ করছে ? জুম্ম অধ্যুষিত তিন জেলা সদরে কতজন জুম্ম টেলিফোন ব্যবহার করছে ? বস্তুত অজুম্ম ব্যবসায়ী ও সরকারী কর্মকর্তাদের সুবিধার্থে এই টেলিফোন সুবিধা সম্প্রসারিত করা হয়েছে। জুম্ম জনগণের উপর সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও অর্থনৈতিক শোষণের ক্ষেত্রে এসব টেলিফোন ব্যবহৃত হচ্ছে। অথচ তা দেখানো হচ্ছে পার্বত্যাঞ্চলের উন্নয়ন তথা জুম্ম জনগণের অগ্রগতির স্বার্থে।

স্বাস্থ্য :—পরিসংখ্যানে স্বাস্থ্য বিষয়ে যে প্রচুর শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেইগুলো মূলতঃ অজুম্মদের সেবায় নিয়োজিত। তিন জেলা সদরের হাসপাতালের ডাক্তার ও রোগীর ৯৫ % ভাগই অজুম্ম। আর মুসলমান অনুপ্রবেশকারী অধ্যুষিত লংগদু, কাপ্তাই, মাটিরাংগা, রামগড় প্রভৃতি এলাকায় হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য যে, অনেক হাসপাতাল নাম সর্বস্ব মাত্র। বস্তুত স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার কোন সরকারী সুযোগ-সুবিধা ও বরাদ্দ জুম্মদের স্বার্থে ব্যয় হচ্ছে না।

সড়ক :—পরিসংখ্যানে সড়ক যোগাযোগের উন্নতি দেখে প্রতীয়মান হয় যে, সেই দুর্গম পার্বত্য-বন্ধুর পার্বত্যাঞ্চল আজ দেশবাসীর নিকট সুগম্য অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। পার্বত্যাঞ্চলের দ্রুত উন্নতির জন্য এই সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন। যেহেতু কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সড়ক যোগাযোগ অপরিহার্য ও অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মূলতঃ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদন ও সংগ্রহে শ্রমের গতিশীলতা বাড়িয়ে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিতে দুর্গম অঞ্চলে সড়ক যোগাযোগই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। কিন্তু পার্বত্যাঞ্চলের সড়ক ব্যবস্থার এই উন্নয়ন কার স্বার্থে ও কি উদ্দেশ্যে করা হয়েছে তা পর্যালোচনার বিষয়। এটা ধ্রুব সত্য যে, সেইরূপ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদন ও সংগ্রহ এবং শ্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি তথা শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির লক্ষ্যে পার্বত্যাঞ্চলের এই সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হয়নি। যেহেতু সড়ক যোগাযোগের এত উন্নতি সত্ত্বেও পার্বত্যাঞ্চলে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান এযাবৎ গড়ে তোলা হয়নি। আর এখানকার বিপুল প্রাকৃতিক মজুতকৃত কাঁচামাল কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য উৎপাদন ও সংগ্রহ করা হচ্ছে না। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, পার্বত্যাঞ্চলে অনুপ্রবেশকারী মুসলমান বাঙ্গালীদের সুবিধার্থে ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন দমনের নামে পার্বত্যাঞ্চলে নিয়োজিত ৭০,০০০ সশস্ত্র বাহিনীর গতিশীলতা বৃদ্ধি করার জন্য এই সড়ক যোগাযোগের উন্নয়ন করা হয়েছে। ১৯৭৮—১৯৮৪ সালের মধ্যে চার লক্ষাধিক মুসলমান বাঙ্গালীকে পার্বত্যাঞ্চলের আনাচে-কানাচে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পুনর্বাসিত করা হয় এবং পুনর্বাসিতদের নিরাপত্তা, রেশন প্রদান, চিকিৎসা সুবিধা তথা সর্বাত্মক সরকারী সেবাদান এবং পার্বত্যাঞ্চলের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রায় চারশত সামরিক ছাউনিতে সেনা চলাচল, খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের জন্য প্রয়োজন হয় সড়ক যোগাযোগের উন্নয়ন। তাই অনিবার্যভাবে বাংলাদেশ সরকারকে এই সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করে পাকা ও কাঁচা সড়ক নির্মাণ করতে হয়। কাজেই স্বাভাবিকভাবে পার্বত্যাঞ্চলে এই সড়ক উন্নয়ন জুম্মদের জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে অনুপ্রবেশকারী ও সশস্ত্র বাহিনীর গতিশীলতার বৃদ্ধির জন্য করা হয়েছে। পার্বত্যাঞ্চলের এই সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়ন জুম্ম জনগণের স্বার্থ পরিপন্থী বলে অস্ট্রেলিয়া সরকার চেঙ্গী ভেলী প্রজেক্টের পাকা রাস্তা নির্মাণ পরিত্যাগ করেছে। (Australia pulled out of the Chengi Valley Road Project after recognizing the fact that the road had been used to facilitate millitary access to the area and to open up the hinterland to the Muslim Bengalee immigrants) তাই পার্বত্যাঞ্চলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো গঠনে এই সড়ক উন্নয়ন কতটুকু জুম্মদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক তা অনুধাবন করা আজ কারো পক্ষে অসাধ্য নয়।

জুমিয়া পুনর্বাসন কর্মসূচী :—১৯৭৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠনের পর এ বোর্ড এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্পাধীন কয়েক হাজার ভূমিহীন জুম্ম পরিবারকে স্বাবলম্বী করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই প্রকল্পে প্রাথমিকভাবে প্রতি ৫০ পরিবারকে নিয়ে যৌথ খামার, আদর্শগ্রাম, যুক্তগ্রাম ও গুচ্ছগ্রাম গড়ে

তোলা হয়। পার্বত্যাঞ্চলে বিভিন্ন এলাকায় অনেক আনন্দ-উল্লাস, মুক্ত-অবাধ-নির্মল পরিবেশে বসবাসরত জুম্ম গ্রাম ধ্বংস করে গড়ে তোলা হয় এসব গ্রাম। এসব গ্রামে জুম্মদেরকে সামাজিক ও আর্থিকভাবে পুনর্বাসনের কথা থাকলেও সেইরূপ কোন আর্থ-সামাজিক সুবিধা প্রদান করা হয়নি। অপরপক্ষে এসব গ্রামের বাহিরে যেতে জুম্মদের চলাচল কড়াকড়িভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ফলে জুম্মদের পরিবারগুলি তাদের ঐতিহ্যগত পেশা জুমচাষ ও প্রাকৃতিক ফলমূল, শাকসবজি সংগ্রহ করা থেকে বঞ্চিত হয়। ফলশ্রুতিতে গ্রামে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সেই সাথে জুম্ম জনগণ সরকারী বাহিনীর সকল বাধা নিষেধ, অত্যাচার নিপীড়নের শিকার হয়ে গ্রামগুলি নির্যাতনের শিবিরে পরিণত হয়। মূলতঃ এসব নিরীহ জুম্মদেরকে জুম্ম জনগণের আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনরত শান্তিবাহিনীর সহযোগী, আশ্রয়-দানকারী, খাদ্যযোগানকারী মনে করে তাদেরকে শান্তিবাহিনীর কার্যক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন ও নির্যাতন করার উদ্দেশ্যে এসব গ্রাম গঠনের পরিকল্পনা করা হয়। ফলে গ্রামগুলি ভিয়েতনামে আমেরিকানদের সৃষ্ট নির্যাতনের শিবিরে (স্ট্র্যাটেজিক ভিলেজ) পরিণত হয়। বর্তমানেও রাঙ্গামাটি, বান্দরবান জেলার বিভিন্ন এলাকায় ও খাগড়াছড়ি জেলার খাগড়াছড়ি সদর থানা, মহালছড়ি, মাটিরাঙ্গা, রামগড়, মাণিকছড়ি, পানছড়ি, দিঘীনালা থানায় শত শত গুচ্ছগ্রাম, শান্তিগ্রাম ও বড়গ্রামে হাজার হাজার জুম্ম এই নিয়ন্ত্রিত শিবিরে জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। জুম্মদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নামে এসব গ্রাম প্রতিষ্ঠা সরকারের ভাওতা ছাড়া আর কিছুই নয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের রিপোর্টে এর প্রমাণ সুস্পষ্ট। এতে বলা হয়েছে— Cluster villages were regularly referred to as "Concentration Camps" and one person summed up the feeling of many hill peoples as follows.....

"To live in a cluster village and to live in jail is the same story."

বলা বাহুল্য যে, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলাতে পুনর্বাসিত মুসলিম বাঙ্গালীরাও এসব গ্রামে দুর্বিসহ জীবন-যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। এসব গ্রামে অজুম্মদের দুরবস্থা সম্পর্কে বিশদ বর্ণনার প্রয়োজন নেই। গত ৩০/১০/৯১ইং তারিখে বহুল প্রচারিত দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত নিম্নের সংবাদ শিরোনামটি তাদের অবস্থা সম্বন্ধে জানতে যথেষ্ট—"লেখাপড়া চাষাবাদ চলাফেরা প্রায় বন্ধ—দুঃসহ জীবন পার্বত্য চট্টগ্রামের দেড়লক্ষ অউপজাতীয় অন্তরীণ" (ওসমান গণি মনসুর)। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত এসব গুচ্ছ-শান্তি-বড়গ্রামে পুনর্বাসিত জুম্ম ও অজুম্মদের রেশনিং এর জন্য প্রতিমাসে প্রয়োজন হয় ১৮ শত মেট্রিক টন চাল। অর্থাৎ মাসিক ব্যয় ২ কোটি টাকা। ১৯৮৮ সাল হতে এ পর্যন্ত এ ব্যবস্থায় প্রায় ২ শত কোটি টাকার খাদ্য শস্য ব্যয়িত হয়েছে। তাই সরকারের এই অর্থ ব্যয় কি পার্বত্যাঞ্চলের জুম্ম জনগণের স্বার্থে ?

উচ্চভূমি বন্দোবস্তিকরণ কর্মসূচী ঃ—পার্বত্য চট্টগ্রাম বোর্ডের এই কর্মসূচীতে ৮,০০০ একর রাবার বাগান ও ৪,০০০ একর উদ্যান সৃষ্টির মাধ্যমে ২,০০০ এবং ৯,০০০ একর বনায়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে ৩০০ জুম্ম পরিবারকে পুনর্বাসনের কাজ চলছে। ইতিমধ্যে ২,০০০ জুম্ম পরিবারকে পুনর্বাসিত, ৬,৭০০ একর রাবার বাগান ও ৩,২৫০ একর উদ্যান সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু পার্বত্যাঞ্চলের সকলের নিকট এটা পরিষ্কার যে, গৃহীত রাবার বাগান প্রকল্পগুলিতে প্রত্যেকটাতে ৪০% এর বেশী রাবার গাছ জীবিত নেই। ঐসব রাবার বাগানে নিয়োজিত জুম্ম পরিবারগুলির আর্থ-সামাজিক অবস্থা পূর্বের অবস্থার চেয়ে অনেক নীচে নেমে গেছে। এরা দিন আনে দিন খেয়ে দুর্বিসহ জীবনযাপন করছে এবং আর্থিকভাবে সম্পূর্ণরূপে সরকারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। উল্লেখিত ৩,২৫০ একরের উদ্যান কোথায় সৃষ্টি করা হয়েছে তা সকলের অজানা। আর ৯,০০০ একরের বনায়ন কর্মসূচীও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। কারণ ইতিমধ্যেই যেটুকু বনাঞ্চল গড়ে তোলা হয়েছে, পুনর্বাসিত মুসলমান বাঙ্গালীদের ব্যাপক ও অবাধ বৃক্ষ নিধনের ফলে এসব বনভূমি প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। তাছাড়া অবৈধভাবে গাছ কাটা ও সমতল জেলায় চালান দেওয়ার ফলে পার্বত্যাঞ্চলের বনভূমি আজ ধ্বংসের মুখে। এসব বনভূমি ধ্বংসের মূলে অবৈধ কাঠ ব্যবসায়ী, বনবিভাগের কর্মচারী ও কর্মকর্তা, সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা জড়িত।

লক্ষণীয় যে, এ প্রকল্পের অধীনে রাবার বাগান, উদ্যান সৃষ্টি ও বনয়ানের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে সত্য কিন্তু কোন বাগান, উদ্যান বা বন সৃষ্টি হচ্ছে না। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কর্মকর্তারাই সবচেয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে মাত্র। জুম্ম জনগোষ্ঠী এই অর্থ বরাদ্দ ও উন্নয়ন প্রকল্পের কোন সুফল পাচ্ছে না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ১৯৭৬—১৯৯০ সালের মধ্যে ৪৫৬ কোটি টাকা ব্যয় করে কৃষি, শিক্ষা, যাতায়াত, ক্রীড়া, সংস্কৃতি, কুটির শিল্প, সমাজকল্যাণ, পূর্ত বিভাগ, স্বাস্থ্য, পুনর্বাসন, রাবার বাগান, উদ্যান ও বন সৃষ্টি প্রভৃতি খাতে এযাবত প্রায় ৭০০-এর অধিক প্রকল্প বাস্তবায়িত করেছে। কিন্তু পর্যবেক্ষক মহলের নিকট এটা পরিষ্কার যে, কয়েকশত কোটি টাকার গৃহীত ও বাস্তবায়িত শত শত প্রকল্প পার্বত্যাঞ্চলের জুম্মদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিসাধন করতে পারেনি। এই বোর্ডের গৃহীত কৃষি, শিল্প, সমাজকল্যাণ, পুনর্বাসন বাগান-উদ্যান-বন সৃষ্টির সকল প্রকল্প ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। কেবলমাত্র জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী যাতায়াত, যোগাযোগ, সংস্কৃতি প্রভৃতি প্রকল্পগুলো সাফল্যজনকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। তাই জুম্ম জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের ব্যর্থতা, জুম্মদের অসন্তুষ্টি প্রশমণের অসফলতার জন্য বোর্ডে কর্মরত জুম্ম কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের উপর দোষ চাপানো হচ্ছে। অথচ বোর্ডের সকল প্রকল্প / বিভাগের প্রধানরা হচ্ছেন বাঙ্গালী মুসলমান। যাকে বলা হয় যত দোষ নন্দ ঘোষ। বাংলাদেশের বহুল প্রচারিত দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় লেখা হয়, দায়িত্বহীন উপজাতীয় কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের দায়িত্বহীনতার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সকল প্রকল্প উপজাতীয়দের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে ব্যর্থ হয়েছে।

এই তো গেল বহুল প্রচারিত পার্বত্যাঞ্চলের উন্নয়ন ফিরিস্তি ও তার বাস্তবতার সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ। পার্বত্যাঞ্চলের তথাকথিত উন্নয়নের এই বাস্তবতার আলোকে সকলে একমত হবেন যে, পার্বত্যাঞ্চলের এই উন্নয়ন সম্পূর্ণ ভাওতাবাজী ও জুম্ম স্বার্থ-বিরোধী। বস্তুত উন্নয়নের নামে বরাদ্দকৃত কোটি কোটি টাকা জুম্মদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ধ্বংস, নিজ বাস্তুভিটা ও জমিজমা থেকে উচ্ছেদ করতে সাহায্য করেছে এবং জুম্মদের অস্তিত্বের অবলুপ্তিকে ত্বরান্বিত করছে। বলা বাহুল্য বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যে কোটি কোটি বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ে জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী বিভিন্ন মারাত্মক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে ও বর্তমানেও করে যাচ্ছে। এবারে আসা যাক পার্বত্যাঞ্চলে জুম্মদের বাস্তব অবস্থার পশ্চাদ চিত্রে। এ চিত্রে রয়েছে পার্বত্যাঞ্চলে জুম্মদেরকে দমন করার জন্য শাসনতান্ত্রিক পদক্ষেপ ও দমনকারী বাহিনীর নিয়োগ এবং উগ্র ঐসলামিক সম্প্রসারণের পদক্ষেপ। নিম্নে এসবের পরিসংখ্যানের একটি সারণী দেয়া গেল :

সাল	অনুপ্রবেশ		প্রশাসনিক ক্ষেত্র			দমনকারী বাহিনী		ঐসলামিক সম্প্রসারণ	
	সংখ্যা	% হার	ইউনিয়ন	থানা	জেলা	ক্যাম্প *	সংখ্যা *	মসজিদ	মাদ্রাসা
১৯৪১	৭,২৭০	২.৯৪	—	—	১	—	২০০	২	—
১৯৫১	২৬,৯৫০	৯.০৯	—	—	১	১০	৫০০	১০	—
১৯৬১	৫৩,৩২২	১৩.৮৫	৩৩	১১	১	২০	১,০০০	৪০	২
১৯৭৪	১,১৬,০০০	২২.৮৩	৪৭	১৩	১	১০০	১০,০০০	২০০	২০
১৯৮১	৩,০৯,৯১৮	৪১.২৩	৬৩	২৮	২	৩০০	৬০,০০০	৫৯২	৩৫
১৯৯১	৪,৫০,০০০ *	৫০ *	৬৩	২৮	৩	৪০০	৭০,০০০	৬৫০ *	৩৭

বিঃ দ্রঃ সারণীর (*) চিহ্নিত সংখ্যাগুলি বাস্তবতার ভিত্তিতে অনুমিত।

উপরোক্ত সারণীতে পার্বত্যাঞ্চলে অজুম্মদের অনুপ্রবেশ ও বৃদ্ধির হার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অজুম্মদের এই আনুপাতিক বৃদ্ধির হার জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্যাঞ্চলকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার ষড়যন্ত্রকে স্পষ্টভাবে ইংগিত করে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় এক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে রহস্যজনকভাবে পার্বত্যাঞ্চলকে মুসলিম প্রধান পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যা জুম্ম জনগণের কাছে অনভিপ্রেত ছিল এবং তৎকালীন জুম্ম নেতৃবৃন্দ রাঙ্গামাটিতে ভারতীয় ও বান্দরবানে

বার্মার পতাকা তুলে এ অযৌক্তিক অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদ জানিয়েছিল। ফলে সেই সময় হতে জুম্ম জনগণ তৎকালীন পাকিস্তানের মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর রোসানলে পতিত হয়। সাথে সাথে শুরু হয় জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্যাঞ্চলকে অজুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার ষড়যন্ত্র ও অজুম্মদের অবাধ অনুপ্রবেশ। এভাবে মুসলমান জনসংখ্যার হার ২%—২০% বৃদ্ধি পায় পাকিস্তান আমলে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সাথে সাথে এই অনুপ্রবেশ আরো অত্যন্ত দ্রুত হারে ঘটতে থাকে। শুরু হয় হাজার হাজার মুসলমান বাঙ্গালীদের অপ্রতিরোধ্য অনুপ্রবেশ ও জুম্ম ভূমি বেদখল। এরপর ১৯৭৮—৮৪ সালের মধ্যে চার লক্ষাধিক মুসলমান বাঙ্গালীকে সুপরিকল্পিতভাবে সরকারী উদ্যোগে পার্বত্যাঞ্চলে প্রতিটি জেলায় পুনর্বাসিত করা হয়। এই পুনর্বাসন পরিকল্পনাকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য এ সময়ে তথাকথিত উন্নয়নের নামে দুর্গম পার্বত্যাঞ্চলকে সুগম করার জন্য শত শত মাইল সড়ক যোগাযোগের উন্নয়ন করা হয় যা উন্নয়ন পরিসংখ্যানে দেখানো হয়েছে। এই অজুম্মদের পুনর্বাসনের সাথে সাথে তাদের নিরাপত্তা, শান্তিবাহিনী দমনের নামে পুনর্বাসিত এলাকায় ও সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় শত শত সশস্ত্র বাহিনী—সেনাবাহিনী, বি ডি আর, আনসার, বি আর পি ও পুলিশের ক্যাম্প গড়ে তোলা হয় এবং সশস্ত্র বাহিনীর সংখ্যা বর্তমান পর্যায়ে উন্নীত হয়।

পার্বত্যাঞ্চলে অনুপ্রবেশ, পুনর্বাসন ও জুম্ম ভূমি বেদখল এবং সশস্ত্র বাহিনীর বৃদ্ধির সাথে সাথে ধরপাকড়, অত্যাচার, নিপীড়ন-নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, হত্যা প্রভৃতি জুম্ম উচ্ছেদ ও নির্মূলীকরণের কার্যাবলী ঘটতে থাকে। ইতিমধ্যে সশস্ত্র বাহিনীর সহায়তায় অনুপ্রবেশকারীরা ১১টি গণহত্যা, সংঘটিত করেছে। এসব হত্যাকাণ্ডে ও সশস্ত্রবাহিনীর নির্যাতনে কয়েক হাজার জুম্ম নরনারী নিহত, শত শত জুম্ম নারী ধর্ষিতা ও শতাধিক জুম্ম গ্রাম ধ্বংস হয়েছে। হাজার হাজার জুম্ম পরিবার নিজ বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়ে পার্বত্যাঞ্চলের বনে-জংগলে ও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। এভাবে পার্বত্যাঞ্চলে জুম্মদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে হুমকির সম্মুখীন হয়। তাদের বিষয় সম্পত্তি ও জীবনমান অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। বর্তমানে পার্বত্যাঞ্চলে তথাকথিত শান্তি-গুচ্ছ-বড়গ্রামে জুম্মদেরকে নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করতে বাধ্য করা হচ্ছে। চলাচলের নিয়ন্ত্রণ, ক্রয়-বিক্রয়ে বাধানিষেধ, অর্থনৈতিক অবরোধ, ব্যবজ সম্পদ আহরণ বন্ধ, জুমচাষ নিষিদ্ধ ও সর্বপ্রকার নির্যাতনের সম্মুখীন জীবনযাপন করছে জুম্ম জনগণ। এসব ব্যবস্থার ফলে জুম্ম জনগণ শুধুমাত্র আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে না। তারা উগ্র ঐসলামিক সম্প্রসারণবাদের শিকার হচ্ছে প্রতিনিয়ত। বিগত ১৫ বৎসরের শত শত বৌদ্ধ বিহার, হিন্দু মন্দির, খ্রীষ্টীয় গীর্জা ধ্বংস করা হয়েছে। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের, নির্যাতন ও হত্যা করা হয়েছে। সর্বোপরি অমুসলিম জুম্ম জনগণকে মুসলমান বানানোর জোর প্রচেষ্টা চলছে। এ যাবৎ অনেক জুম্মকে জোরপূর্বক, ভয় ও প্রলোভনের মাধ্যমে মুসলমান বানানো হয়েছে। উপরোক্ত সারণীতে ইসলামী মাদ্রাসা ও মসজিদের সংখ্যা বৃদ্ধি এই ঐসলামিক সম্প্রসারণবাদের সাক্ষ্য বহন করে।

এই অস্তিত্ব বিপন্ন দশ ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জাতিসত্তার জন্য বাংলাদেশ সরকারের কোটি কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প এক অভাবনীয় ব্যাপার। যে সরকার ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর, জুম্মদের ভূমি ও বাস্তুভিটা বেদখল করতে সদাসচেষ্ট, নির্যাতন ও হত্যার মাধ্যমে বিলুপ্ত করতে উদ্যত, সেই সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জুম্ম জনগণের জন্য কোটি কোটি টাকার উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের সাফাই গাওয়া খুবই হাস্যকর।

উপরোক্ত সরকারী উন্নয়ন ফিরিস্তির বাস্তব বিশ্লেষণ ও জুম্মদের বাস্তব অবস্থার পশ্চাদচিত্র আলোচনায় পার্বত্যাঞ্চলে উন্নয়নের এক পরস্পরবিরোধী চিত্র ফুটে উঠে। তার অর্থ এই নয় যে, পার্বত্যাঞ্চলে কোন উন্নয়ন সাধিত হয়নি। এখন আসা যাক, সরকারী এই উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে বাস্তবে কারা লাভবান হয়েছে সেই প্রসঙ্গে। বিগত ১৫ বছরে সরকারী উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে পার্বত্যাঞ্চলে যে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা অনস্বীকার্য। এই উন্নয়ন ও পরিবর্তনের সংক্ষিপ্তসার নিম্নে দেয়া গেল।

* পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও ইউনিয়ন-উপজেলা-জেলা পর্যায়ের উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে জুম্ম জনগণের সংখ্যা-গরিষ্ঠ অংশ মোটেই উপকৃত হয়নি। এসব উন্নয়ন প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট জুম্ম ও অজুম্ম কর্মচারী ও কর্মকর্তারা বিশেষত সামরিক কর্মকর্তারাই সবচেয়ে বেশী লাভবান হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যয়িত অর্থের সিংহভাগ তাদের পকেটে চলে গেছে;

* প্রকল্পে ব্যয়িত অর্থের সিংহভাগ সড়ক নির্মাণ খাতে ব্যয় করা হয়েছে যা পুনর্বাসিত মুসলমান অনুপ্রবেশকারী ও সশস্ত্রবাহিনীর চলাচলের সুবিধা প্রদান করছে ;

* সরকারী অফিস ও বহিরাগত মুসলিম কর্মচারী কর্মকর্তাদের বাসস্থানের সুবিধার্থে জেলা ও উপজেলা সদরে প্রচুর দালান কোঠা করা হয়েছে ;

* শতকরা ৯৯ ভাগ অজুম্ম ব্যবসায়ী, ঠিকাদার, মধ্যসত্ত্বভোগী দালালরা সম্প্রসারিত ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে ;

* জুম্মদের ২% ভাগকে গাছের পারমিট, লাইসেন্স, গম-ডাল-চালের অনুদান দিয়ে সুবিধাবাদী ও দুলাগোষ্ঠী হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে ;

* অজুম্ম ব্যবসায়ী, সরকারী কর্মচারী ও সামরিক কর্মকর্তাদের সেবাদানের জন্য জেলা ও উপজেলা সদরে টেলিফোন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে ;

* বিদ্যুৎ ও স্বাস্থ্য খাতের সব সুযোগ-সুবিধা শহর এলাকায় বসবাসরত অনুপ্রবেশকারীরাই ভোগ করছে ;

* শিক্ষা ক্ষেত্রে ৫০% সুযোগ-সুবিধা অজুম্ম ছাত্র-ছাত্রীরাই ভোগ করছে ;

* পুনর্বাসিত জুম্ম পরিবারদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কোন উন্নতি সাধিত হয়নি ;

* রাবার বাগান, উদ্যান ও বনসৃষ্টির প্রকল্পগুলি পূর্ণবাস্তবায়ন হয়নি ;

* কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নয়ন আশাব্যঞ্জক নয় ;

* জেলা ও উপজেলা সদরে সরকারী বাসস্থান, সেনাক্যাম্প, বাজার ও শহরের পার্শ্ববর্তী অজুম্ম বাসস্থানে পানীয় জলের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে ;

* পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডে ৯০% জন নিম্নপদস্থ জুম্ম কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে ;

উপরোক্ত আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে, পার্বত্যাঞ্চলে গৃহীত কোটি কোটি টাকার উন্নয়ন ব্যয় জুম্ম জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কোন উন্নতি সাধন করেনি। অনেক ক্ষেত্রে এসব প্রকল্প জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী হিসেবে গৃহীত হওয়ায় জুম্মদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার আরো অবনতি ঘটিয়েছে। আর্থিক কাঠামো ভেঙ্গে দিয়ে তাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে। তাই সাপ্তাহিক বিচিন্তায় এক প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয় যে, ১৯৭৬ ইং সনে জানুয়ারী মাসে গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। বোর্ডের আওতায় প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। সুন্দর পথ-ঘাট এবং সুরম্য অট্টালিকায় ভরে উঠেছে। কিন্তু ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার অর্থনৈতিক মানের কোন উন্নতি হচ্ছে না। এখানকার বনে-জংগলে অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এর সদ্ব্যবহার হচ্ছে না। এবং ১৯৮৮ সনে আগষ্ট মাসে বি আর বি (বাংলাদেশ রিসার্স ব্যুরো) এর প্রধান জনাব শফি উল্লাহ কর্তৃক বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহে আয়োজিত সেমিনারে অধিকাংশ অংশগ্রহণকারীদের মতামতে বলা হয়েছে...The speakers opined that tribal people were being subjected to economic exploitation and they did not benefit from any development work took place in their area.

এছাড়া, গত ৬ই নভেম্বর '৯২ ভোরের কাগজে প্রকাশিত "পার্বত্য চট্টগ্রাম : উন্নয়ন ব্যবসা নয় প্রয়োজন রাজনৈতিক সমাধান" নিবন্ধে সাংবাদিক ইমতিয়ার শামীম লিখেছেন...পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের উদ্যোগও ছিলো বাঙ্গালীমুখী। তিনি তাই বাঙ্গালীমুখীনতার উদাহরণ দিয়েছেন... রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে, তার টেণ্ডার পেয়েছে বাঙ্গালী ঠিকাদার, সেখানে কাজ করেছে বাঙ্গালী শ্রমিক। উপজাতীয় অসন্তোষ দমনের জন্য বৈদেশিক প্রতিরক্ষার নামে সেনা সংখ্যা বাড়ানো হয়েছিল, সেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছিল বাঙ্গালীরা। বিভিন্ন গবেষণামূলক অনুসন্ধানে দেখা যাচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড থেকেও লাভবান হয়েছে বাঙ্গালীরা।

অধিকন্তু অত্যন্ত পরিহাসের বিষয় যে, সত্যিকারের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে যা বোঝায় তার সাথে কোন সঙ্গতি না রেখে পার্বত্যাঞ্চলের এই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা জুম্ম জনগণের উন্নয়ন হিসেবে অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে। এতে বুঝা যায় প্রকৃত অর্থনৈতিক উন্নয়ন কি সেই সম্বন্ধে অপব্যাখ্যাকারীদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। অন্যথায় তাদের উন্নয়নের আলোচনা প্রকৃত পার্বত্য সমস্যাকে ঢাকা দিতে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। তাই অপব্যাখ্যাকারীদের জ্ঞাতার্থে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞা আলোচনা করা হল। উইলিয়াম এবং বাট্রিকের

মতে—"অর্থনৈতিক উন্নয়ন সেই প্রক্রিয়াকে বুঝায় যা দ্বারা কোন দেশের বা অঞ্চলের জনগণ মাথাপিছু দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন অব্যাহতভাবে বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দেশের প্রাপ্ত সম্পদের সদ্ব্যবহারের প্রয়াসী হয়।" বস্তুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়টি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন কথাটা কোন দেশের/অঞ্চলের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন বুঝায়। অর্থাৎ কোন দেশের/অঞ্চলের উৎপাদন বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতার অগ্রগতি, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতি, দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা এবং সমাজের অনগ্রসরতাকে দূর করার উদ্দেশ্যে নিবেদিত সমন্বিত কর্মধারা ও নীতিসমূহের বাস্তবায়ন প্রভৃতিও দেশের / অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্দেশ করে। (উন্নয়ন অর্থনীতি ও পরিকল্পনা, মোহাম্মদ জিয়াউল হক)

তাই পার্বত্যাঞ্চলের জুম্মদের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে এই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংজ্ঞার মিল আছে কি? সুতরাং পার্বত্যাঞ্চলের উন্নয়ন বলতে...

* শুধুমাত্র পাকা রাস্তা নির্মাণ নয়;
* সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ নয়;
* জুম্মদের উচ্ছেদ করে অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের পুনর্বাসন নয়;
* প্রায় চার শত সেনা ছাউনি স্থাপন নয়;
* বিহার, মন্দির, গীর্জা ধ্বংস করে তৎস্থলে মসজিদ নির্মাণ নয়;
* গুচ্ছগ্রাম-শান্তিগ্রাম-বড়গ্রামের নিয়ন্ত্রণ নয়;
* ৭০ হাজার সশস্ত্র বাহিনীর উপস্থিতি ও শ্বেত সন্ত্রাস নয়।

অভিমত

পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ উন্নয়ন ব্যবসা নয় প্রয়োজন রাজনৈতিক সমাধান

ইমতিয়ার শামীম

আসলে প্রতিটি সমাজই তার নিজস্ব বর্ণময়তার ঐশ্বর্য নিয়ে কোনো না কোনো জায়গায় গড়ে উঠেছে। তথাকথিত আদিম সমাজগুলো আসলে মোটেই আদিম নয়। তাদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে যাওয়া উচিত নয়, আবার সৃষ্টির শুরুতে তারা যেমনটি ছিলো ঠিক তেমনটি থাকাও সম্ভব না। বাস্তবিকই সেটা তারা পারছেও না। আবার তারা ইতিহাসেরও অন্তর্গত। কিন্তু এই সব পরিবর্তন সমূহের মধ্যে একটি ভারসাম্য রচনার মনোভাব তাদের আছে...।

পেরুভীয় সাংবাদিক মানুয়েল ওসারিও'র সঙ্গে নৃতাত্ত্বিক ক্লদ লেভি—স্ট্রাউস-এর সাক্ষাৎকার।

বেশ ক'টি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সংবাদের মধ্যে এটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যে গতকাল ৫ নভেম্বর উপজাতীয় সমস্যা নিয়ে শান্তিবাহিনীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে সরকার পক্ষের।

গত ১৮ বছর ধরে তথাকথিত উন্নয়ন আর রাজনৈতিক সমাধান প্রচেষ্টার তোয়াক্কা না করে মহীরুহ হয়ে ওঠা এই সমস্যা উত্তরণের ক্ষেত্রে এ বৈঠক ও আলোচনা থেকে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসবে, আমরা সবাই এ রকমই প্রত্যাশা করছি। কিন্তু তারপরও রাষ্ট্রীয় সংহতির নামে, উন্নয়নের নামে এতোদিন পার্বত্য অঞ্চলে কি হয়েছে সেটি একটি বড় প্রশ্ন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে, ১৯৭৮-এর একটি তথ্য মতে, প্রতি ৮ জন সাধারণ উপজাতীয় অধিবাসীর জন্যে রাখা হয়েছিলো ১ জন সশস্ত্র সামরিক বাঙালী। সোজা কথায়, পুরোপুরি শক্তি প্রয়োগ করে উপজাতীয়দের 'মানুষ' করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিলো রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে। আর এসব করেছিলেন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের' কাঠামোতে—যে কাঠামো, তাদের মতে, আত্মস্থ করেছে এবং স্থিরতা দিয়েছে বাঙালী ছাড়াও এ দেশীয় অন্যান্য জাতিসত্তাকে। তারও আগে, পাঞ্জাবী জাতিসত্তার একাধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বাংলাদেশের আলাদা রাষ্ট্রসত্তা নির্মাণের নায়ক শেখ মুজিবুর

সমস্যার আশু রাজনৈতিক সমাধান এবং সুদূরপ্রসারী নৃতাত্ত্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রসঙ্গ পাহাড়িদের সঙ্গে সরকারের বৈঠকে বিশেষভাবে প্রাধান্য পাক, এটি আমাদের সকলেরই প্রত্যাশা। এই রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া—পদ্ধতি কি হবে এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার পরই সমাধানে পৌঁছুনো যেতে পারে। মনে রাখা দরকার, পাহাড়িদের কাছে গ্রহণযোগ্য না হলে কোনো সমাধানই সমাধান হিসেবে গ্রাহ্য হবে না। পাহাড়িদেরও এ ব্যাপারে নিজেদের সাংস্কৃতিক—জাতিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে যৌক্তিক সমাধানে পৌঁছুনোর চেষ্টা করা উচিত।

রহমান বলেছিলেন, 'চাকমারাও চিহ্নিত হবে বাঙালী হিসেবে, আলাদা কোনো পরিচিতি নেই তাদের...'। তারপরও মুজিব শাসনামলে সামরিক নিপীড়ন চালানোর প্রয়োজন পড়েনি। কিন্তু জিয়াউর রহমান এলেন এবং সামরিক কায়দায় চেষ্টা চালালেন তাদের বাঙালীর বদলে বাংলাদেশী বানানোর। গোটা ব্যাপারটাই দাঁড়ালো এরকম যে, কেউই চাননি তারা চাকমা হয়ে উঠুক, মারমা হয়ে উঠুক কিংবা হয়ে উঠুক তাদের নিজস্ব উপজাতীয় সত্তা নিয়ে স্ব-সামাজিক। তারা চেয়েছেন, উপজাতীয়দের বাঙালী কিংবা বাংলাদেশী বানাতে।

উপজাতীয়দের নৃতাত্ত্বিক ঐতিহ্যকে এড়িয়ে গিয়ে রাষ্ট্রীয় সংহতি প্রতিষ্ঠার এবং উন্নয়ন প্রচেষ্টার ফলাফল স্বভাবতই গিয়ে ঠেকেছে শূন্যের কোঠায়। এ দেশের ঐতিহ্যবাহী আমলাতন্ত্র এক পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিন জেলায় ভাগ করে আমলাতন্ত্রের শিকড়কে বিস্তৃত করেছে। ১২টি থানাকে ভাগ করে সৃষ্টি করেছে ২৮টি 'উপজেলা'তে, এরপর হয়ে গেছে আবার থানা। আর আমলাতন্ত্রের এই প্রশাসনিক ব্যাপ্তিকে সুনিশ্চিত করার জন্যে বাড়ানো হয়েছে মিলিটারী আর প্যারা-মিলিটারী আউট পোস্ট, ক্যাম্প এবং সেনানিবাস। জনতাত্ত্বিক ধারার বিষয়টিকেই ধরা যাক। রাষ্ট্রযন্ত্র পরিকল্পনা নিয়েছিলো সর্বক্ষেত্রে বিপরীতক্রিয়ার মাধ্যমে উপজাতীয়দের বাঙালী কিংবা বাংলাদেশী-করণ করার। এ উদ্দেশ্যে পার্বত্য এলাকায় ক্রমাগত বাড়ানো হতে থাকে বাঙালী অধিবাসী। ১৯৭৪-এ বাঙালী ও উপজাতীয় আনুপাতিক হার ছিলো ৮০ : ২০, ১৯৮১তে ৭২ : ২৮। ১৯৮১-৮২তে বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে আরো এক লাখ বাঙালী আবাসনের জন্যে ৬ কোটি (৬০ মিলিয়ন) টাকা বরাদ্দ করেন। সামরিক বাহিনীর তত্ত্বাবধানে জেলা প্রশাসন সরাসরি উদ্যোগ নেয় আবাসন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার।

আবাসন প্রক্রিয়া বাঙালীদের জন্যে এনে দেয় নতুন অবারিত অর্থনৈতিক লুণ্ঠনক্ষেত্র এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ। পার্বত্য অঞ্চলে বাঙালী আবাসন কর্মসূচী'তে কাগজে-কলমে বলা হয়েছিলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে গরীব বাঙালীদের বসতি স্থাপনের অনুমতি দেয়ার জন্যে। সম্ভবত পরিকল্পনাবিদদের ধারণা ছিলো এর ফলে গরীব বাঙালীরা যে কোনো উপায়ে পার্বত্য এলাকায় স্থিতি পেতে চাইবে। কেননা এ ধরনের প্রতিটি পরিবারের জন্যে বরাদ্দ ছিলো বিনামূল্যে ৫ একর পাহাড়ী জমি, কৃষি উপকরণ কেনার জন্যে এবং গৃহনির্মাণের জন্যে নগদ ১৫ হাজার টাকা, তাছাড়া উপজাতীয় অসন্তোষের মুখে অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে সামরিক সমর্থন।

নিঃসন্দেহে এ ধরনের উদ্যোগ ছিলো সমতলের ভূমিহীন কিংবা প্রান্তিক কৃষকদের কাছে স্বর্গে যাওয়ার মতো সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু এই স্বর্গে যাওয়ার জন্যে পাপ পুণ্যের নিক্তি তুলে ওজন করার ক্ষমতা ছিলো স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের হাতে। অতএব, সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে ইউপি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্যে সৃষ্টি হয় উৎকোচ গ্রহণের স্বর্ণ-সুযোগ। অনেক প্রান্তিক কৃষক তার সামান্য সমতলভূমি চেয়ারম্যানকে লিখে দিয়ে বিনিময়ে সংগ্রহ করেন আরো বেশি জমি এবং নগদ ১৫ হাজারা টাকা পাওয়ার সার্টিফিকেট। এভাবে সমতল এলাকায় গ্রামীণ এলিটরা জমি কেন্দ্রীকরণের নতুন একটি প্রক্রিয়া স্থাপন করেন।

যেহেতু পার্বত্য এলাকার নতুনভাবে আবাসন স্থাপনকারীরা পার্বত্য ভূমির চাষাবাদ কৌশলের সঙ্গে অপরিচিত সেহেতু দ্রুত সেই অনিবার্য পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় : যে পরিস্থিতিতে বাঙালীরা অপ্রসর হয় অধিকতর ভালো জমি কেড়ে নেয়ার দিকে কিংবা পাহাড়ীদের পরিশ্রমের ফসল চূড়ান্ত মুহূর্তে ছিনিয়ে নেয়ার দিকে। প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক অদৃশ্য সহায়তাও যে এতে ছিলো সেটি বোধ হয় আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

এর পাশাপাশি উপজাতীয়দের দিকটা চিন্তা করা যাক। সম্পত্তি সংরক্ষণের আইনগত দাবি-দাওয়া প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রয়োজনীয় দলিলপত্র তৈরির প্রয়োজন তাদের কোনো কালেই ছিলো না। এ জন্যে এ ধরণের সরকারি ঘোষণাও তাদের কখনো আকৃষ্ট করেনি। কেননা তাদের নৃতাত্ত্বিক ঐতিহ্য এ ধরণের প্রয়োজন-নির্ভর নয়। সম্পত্তির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা তারা শিখেছে নিজেদের ভূমি মালিকানা ও ভূমি ব্যবহারের প্রথাগত ধারণা বাঙালীদের কাছে হারিয়ে, রক্তাক্ত পথে।

তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নের উদ্যোগও ছিলো বাঙালী-মুখী। কিন্তু আবাসন স্থাপনকারী এই বাঙালীদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না আধুনিক কৃষির কৃৎকৌশলগত বিনিয়োগ করা। উপজাতীয়দের পক্ষে তো তার প্রশ্নই ওঠে না। অতএব, হর্টিকালচারাল উন্নয়নের নামে ঘোষণা দেয়া হয় জেলার ডেপুটি কমিশনার ২৫ একর পর্যন্ত পাহাড়ী জমি কোনো ব্যক্তি কিংবা কোম্পানীকে বরাদ্দ দিতে পারবেন, ডিভিশনাল কমিশনার দিতে পারবে একশ' একর পর্যন্ত। আর তার বেশি জমি বরাদ্দেরও অনুমতি মিলবে, তবে তা নিতে হবে ভূমি প্রশাসন মন্ত্রণালয়ে এসে।

শুধু আবাসন প্রক্রিয়াতেই নয়, উন্নয়নের বাঙালী অভিমুখিনতাকে দেখানো সম্ভব সব ক্ষেত্রেই। রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে, তার টেণ্ডার পেয়েছে বাঙালী ঠিকাদার, সেখানে কাজ করেছে বাঙালী শ্রমিক। উপজাতীয় অসন্তোষ দমনের জন্যে বৈদেশিক প্রতিরক্ষার নামে সৈন্য সংখ্যা বাড়ানো হয়েছিল, সেখানে কর্মসংস্থানে সুযোগ পেয়েছিল বাঙালীরা। বিভিন্ন গবেষণামূলক অনুসন্ধানে দেখা যাচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড থেকেও মূলত লাভবান হয়েছে বাঙালীরা। বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা গিয়েছে সেখানে, উদ্ভট সব পরিকল্পনা নিয়ে, যা পরিবেশকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলছে।

একদা এদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণের নামে নেয়া উদ্ভট সব পরিকল্পনার মাশুল দিতে হচ্ছে বর্তমানের মানুষদের। পার্বত্য অঞ্চলে উন্নয়নের আশু চেহারা এই আমলা ও মধ্যবিত্ত বাঙালীর আপাত আয়বৃদ্ধি এবং তথাকথিত সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এবং উন্নয়নের সুদূরপ্রসারী চেহারা এখন ক্রমশঃ ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হচ্ছে। কেননা, পরিবেশ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার প্রশ্নটি এ উন্নয়ন পরিকল্পনায় নিশ্চিত করা হয়নি।

অতএব, সমস্যার আশু রাজনৈতিক সমাধান এবং সুদূরপ্রসারী নৃতাত্ত্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রসঙ্গ পাহাড়িদের সঙ্গে সরকারের বৈঠকে বিশেষভাবে প্রাধান্য পাক, এটি আমাদের সকলেরই প্রত্যাশা। এই রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া-পদ্ধতি কি হবে এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার পরই সমাধানে পৌঁছুনো যেতে পারে। মনে রাখা দরকার, পাহাড়িদের কাছে গ্রহণযোগ্য না হলে কোনো সমাধানই সমাধান হিসেবে গ্রাহ্য হবে না। পাহাড়িদেরও এ ব্যাপারে নিজেদের সাংস্কৃতিক-জাতিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে যৌক্তিক সমাধানে পৌঁছুনোর চেষ্টা করা উচিত।

ইমতিয়ার শামীম : গল্পকার, সাংবাদিক।
সৌজন্যে ভোরের কাগজ, ঢাকা,
নভেম্বর ৬, ১৯৯২

—০—

পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে

রস ড্যানিয়েলস

কাগজ প্রতিবেদক : এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল আন্তর্জাতিক নির্বাহী পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর রস ড্যানিয়েলস বলেছেন, সন্ত্রাস দমন আইনে মানবাধিকার লংঘিত হতে পারে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে। বাংলাদেশে একটি গণতান্ত্রিক সরকার নির্বাচিত হয়েছে। একটি গণতান্ত্রিক সরকারের উচিত, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমস্যার সমাধান করা। গতকাল বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এক সেমিনার ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি একথা বলেন। এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-এর সভাপতি আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় ব্যারিস্টার লুৎফর রহমান শাহজাহান বক্তৃতা দেন। এ্যামনেস্টি বাংলাদেশ-এর মহাসচিব মোহাম্মদ কামালউদ্দিন শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল-এর চেয়ারম্যান প্রফেসর রস ড্যানিয়েলস আরো বলেন, এই উপমহাদেশে সবচেয়ে বেশি মানবাধিকার লংঘিত হয় বার্মায়। তিনি বলেন, বিশ্বে ৬০টি দেশে মানবাধিকার লংঘিত হওয়ার খবর এ্যামনেস্টির কাছে আছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে লংঘনের খবর সবচেয়ে বেশি।

তিনি আরো বলেন, জাতিসংঘ মানবাধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারছে না। তিনি বলেন বোসনিয়া হারজেগোভিনাসহ বিভিন্ন ইস্যুতে জাতিসংঘের এই ব্যর্থতা ফুটে উঠেছে।

ব্যারিস্টার লুৎফর রহমান শাহজাহান বলেন, সন্ত্রাস দমন আইন মানবাধিকার লংঘনের সবচেয়ে বড় উদাহরণ। তিনি বলেন, ভারতের কাশ্মীর, গুজরাট ও পাঞ্জাবে এ ধরণের আইন আছে এবং ভারতের গুজরাটে এই আইনের অপপ্রয়োগ হওয়ার যথেষ্ট খবর রয়েছে।

সৌজন্যে : ভোরের কাগজ, ঢাকা,
১১ ডিসেম্বর, ১৯৯২

সংবাদ

খালেদা জিয়ার কাছে খোলা চিঠি

জনসংহতি সমিতির সাথে বাংলাদেশ সরকারের সাম্প্রতিক আলোচনার ইতিবাচক ফলাফলের আশাবাদ ব্যক্ত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের কো-চেয়ারম্যান ডগ্লাস সেনডার্স বেগম খালেদা জিয়ার নিকট এক খোলা চিঠি প্রেরণ করেছেন।

৭ই জানুয়ারী/৯৩ এর তারিখে লিখিত এই চিঠিতে লোগাং হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে জুম্ম জনগণের উপর আধা সামরিক বাহিনীর হত্যাকাণ্ড চালানোর অভিযোগ করা হয়। লোগাং হত্যাকাণ্ডের তদন্ত কমিশনের রিপোর্টকে চিঠিতে অবান্তর (inconsistant) নিষ্পত্তিহীন (inconclusive) এবং পরস্পরবিরোধী (contradictory) বলে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া এই রিপোর্টের বিশ্লেষণকে কমিশনকে দেয়া সামরিক বাহিনীর বিশ্লেষণের সদৃশ বিশ্লেষণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

এই চিঠিতে কমিশন এই উদ্বেগ প্রকাশ করে যে, জুম্ম জনগণের বেদখলকৃত ভূমির পুনরুদ্ধার না করে বাংলাদেশ সরকার ক্যাডেস্ট্রেল সার্ভে পরিচালনার পদক্ষেপ নিয়েছে। আর লক্ষাধিক একর পাহাড়ী জমিতে বনায়নের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে, যার ফলে ৪০,০০০ জুম্ম পরিবার নিজ বাগ-বাগিচা ও বাস্তুভিটা হারাবে। এছাড়া বান্দরবান জেলায় আরো ১৯,০০০ একর জমি অধিগ্রহণ করে সামরিক ক্যাম্প বসানোর ফলে হিংসাত্মক কার্যকলাপ বৃদ্ধি ও হত্যাকাণ্ড ঘটবে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

পরিশেষে ত্রিপুরাতে অবস্থানরত ৫৬ হাজার জুম্ম শরণার্থীদের মানবেতর জীবন ও রেশন বন্ধ করে স্বদেশে ফিরতে বাধ্য করার জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। কমিশন এই মত ব্যক্ত করে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান ব্যতীত যেন শরণার্থীদের বাংলাদেশে ফিরে আসতে উৎসাহিত করা না হয়।

আমেরিকান কংগ্রেসে পার্বত্য চট্টগ্রাম গণহত্যা

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ১০৩ তম কংগ্রেসে পার্বত্য চট্টগ্রামের গণহত্যার বিষয়টি উত্থাপন করার এক প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। বিলম্বে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে যে, আমেরিকা কংগ্রেসের প্রভাবশালী সিনেটর এডওয়ার্ড এম কেনেডি পার্বত্য চট্টগ্রামের গণহত্যার বিষয়টি ১০৩ তম কংগ্রেসে (সংশ্লিষ্ট বিল উত্থাপনের সময়) উপস্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি গত ১০ই নভেম্বর/৯২ তারিখে জনসংহতি সমিতির ইউরোপীয় মুখপাত্র ডঃ আর এস দেওয়ানকে লিখিত এক পত্রে এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। উল্লেখ্য যে এডওয়ার্ড এম কেনেডি হলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রভাবশালী প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

মস্কোতে আদিবাসী বিষয়ক সম্মেলন

আগামী মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মস্কোতে ৫ দিনের এক আদিবাসী বিষয়ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত সম্মেলনে যোগদানের জন্য আগরতলা ভিত্তিক মানবিক সুরক্ষা ফোরামের (এইচ, পি, এফ) এর সভাপতি শ্রী ভাগ্য চন্দ্র চাকমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

অতি সম্প্রতি গঠিত "কংগ্রেস অব নেশনস এণ্ড স্টেটস" (সি, এন, এস) এর উদ্যোগে ও রাশিয়ান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গত দশকের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে আদিবাসীদের সহিত রাষ্ট্র বা জাতিসমূহের উদ্ভূত বিরোধ প্রশমণের বিভিন্ন দিক আলোচনাই এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য। এছাড়া বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যেকার এবং রাষ্ট্র ও জাতি সমূহের মধ্যেকার অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, কৌশলগত ও ভৌগোলিক বিষয়সমূহ সম্মেলনে আলোচিত হবে।

এ সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমেরিকা, জার্মান, জাপানসহ বিভিন্ন রাষ্ট্র ও আদিবাসী বিষয়ক বিভিন্ন বেসরকারী ও বহুজাতিক সংস্থাগুলোকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, জাপান, জার্মান, আমেরিকাসহ সামি, মাসাই, লুম্মি, সান ব্লাস কুনা, ইয়াকুট সাখা ও তিব্বতী জাতিসমূহের প্রতিনিধিদের

সমন্বয়ে গত বছরের জুলাই মাসে সি, এন, এস এর প্রস্তাব কমিটি গঠিত হয়েছিল।

ঢাকাস্থ রাষ্ট্রদূতের প্রতি কংগ্রেসীয় মানবাধিকার বিভাগের পত্র

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কংগ্রেসনেল হিউম্যান রাইটস্ ককাস এর কো-চেয়ারম্যান মিঃ টম লেনটোস লোগাং হত্যাকাণ্ডের জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম বি মিলামকে ১৮ই ডিসেম্বর '৯২ তারিখে লেখা এক পত্রে তিনি এ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এই পত্রে তিনি উল্লেখ করেন যে, লোগাং হত্যাকাণ্ডের জন্য তিনি মর্মাহত ও আতঙ্কিত হয়েছেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের বেসামরিক লোকদের হত্যার জন্য বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যুদ্ধরত শান্তিবাহিনীর বিদ্রোহকে ওজর হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্টে উল্লেখিত সরকারী বাহিনী কর্তৃক অত্যাচার, ধর্ষণ ও বিনা বিচারে হত্যার কথাও তিনি ঐ পত্রে উল্লেখ করেন।

পরিশেষে তিনি রাষ্ট্রদূতকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করে লোগাং হত্যাকাণ্ড তদন্ত করার এবং বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মৌলিক, মানবিক ও রাজনৈতিক অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে বলেন।

যুদ্ধবিরতি লংঘনের দায় দায়িত্ব এড়াতে অভিনব কৌশল

জনসংহতি সমিতির সাথে বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত যুদ্ধবিরতি লংঘনের দায় দায়িত্ব এড়াতে বাংলাদেশ সেনা-বাহিনী সদস্যদের এক অভিনব কৌশল অবলম্বনের রহস্য উদঘাটিত হয়েছে।

বিগত ১৯শে জানুয়ারীতে ন্যাক্যা পাড়া সাব জোন ক্যাম্পের সুবেদার আফজলের নেতৃত্বে ৪০ নং ইবিআর ইঞ্জিনিয়ারিং কোর এর ১৫ জন সেনা সদস্য গুইমারা মৌজাসহ দেওয়ান পাড়ায় বিশ্রামরত ৪ জন শান্তিবাহিনী সদস্যের উপর এক হামলা চালিয়েছে। এই হামলায় শান্তিবাহিনীর সদস্যরা অক্ষতভাবে সরে যেতে সক্ষম হলে সেনা সদস্যরা গ্রামবাসীদের উপর চড়াও হয়। মিসেস অংক্রাই মারমা (২৫), স্বামী রিপ্রুসাই মারমা, মিসেস ক্রাজাই মারমা (২৪), স্বামী সুইজাইউ মারমা ও ম্রাস্যাংসিং মারমা (৩৪), স্বামী তপন চৌধুরীকে বেদম প্রহার করে। সেনা সদস্যরা মিসেস অংক্রাই মারমার একটি সিন্দুক কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে ভেঙ্গে ১টি সোনার আংটি, ৫টি রূপার টাকা ও যাবতীয় কাপড়-চোপড় লুট করে নিয়ে যায়।

এ ঘটনার পরদিন গুইমারা জোন কম্যাণ্ডার লেঃ কর্ণেল ওয়াহাব সমস্ত গ্রামটি ঘেরাও করে ও আবালবৃদ্ধবনিতাকে স্থানীয় বৌদ্ধ বিহারে জড়ো করে মারপিট করে। "সংঘটিত ঘটনায় শান্তিবাহিনীরা প্রথমে ৩ রাউণ্ড ফায়ার করলে আর্মিরা পাল্টা গুলি চালাতে বাধ্য হয়" এই মর্মে লিখিত দলিলে জড়ো-কৃত সকলকে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য করে। এই দলিলে ৫০ জন গ্রাম-বাসী স্বাক্ষর দিতে বাধ্য হয়।

নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক শান্তিবাহিনী আক্রান্ত অস্ত্র লুঠ ও নিরীহ গ্রামবাসীসহ শান্তিবাহিনী আহত

বাংলাদেশ নিরাপত্তা বাহিনীর এক এ্যাম্বুশে শান্তি-বাহিনীর একটা ছোট্ট দল আক্রান্ত হলে একজন শান্তিবাহিনী সদস্য সামান্য আহত হয়েছে। ঘটনায় শ্রী কাশ্যপ তঞ্চঙ্গ্যা (৫০) নামক এক নিরীহ ও গরীব গ্রামবাসীও গুরুতরভাবে আহত হয়ে শত্রু বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। বিগত ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩, রাঙ্গামাটি জেলাধীন রেংখ্যং সংরক্ষিত বনাঞ্চলের রেংখ্যং নদীর উৎসস্থলের কাছে তিনবান এলাকার গুলমোড় নামক স্থানে সংঘটিত এই ঘটনায় শান্তিবাহিনীর এই দলটি ১০৫ রাউণ্ড কার্টুজসহ একটি স্বয়ংক্রিয় রাইফেল ও একটি সাবমেশিন কারবাইন এবং ব্যবহার্য্য কাপড়-চোপড়সহ তিনটা রুকস্যাক শত্রুর কাছে হারায়।

উল্লেখিত ঘটনাস্থল থেকে কুড়ি মাইল দূরবর্ত্তী ফারুয়া নামক স্থানে অবস্থিত একটি আর্মি ক্যাম্প ও একটি পুলিশ ক্যাম্প ছাড়া কাছে পিছে বাংলাদেশ নিরাপত্তা বাহিনীর কোন ছাউনি ছিল না। যুদ্ধবিরতির সময়ে এতদূর গভীর বনাঞ্চলে গিয়ে শান্তিবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার পিছনে শান্তি-বাহিনীকে যুদ্ধবিরতি চুক্তি লংঘন করতে প্রলুব্ধ করে শান্তি প্রক্রিয়া বানচাল করা ছাড়া আর কোন গ্রহণযোগ্য যুক্তি থাকতেই পারে না।

বাংলাদেশ সরকারের যুদ্ধবিরতি লংঘন

উভয় পক্ষের মধ্যে বিরতি সত্বেও বাংলাদেশ সরকার এ যাবৎ যুদ্ধবিরতি লংঘন করে আসছে।

বিগত ২৬শে ডিসেম্বর '৯২ তারিখে বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির ৮ম বৈঠক (বর্তমান সরকারের সহিত ২য়) অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে চলিত বছরের ১লা জানুয়ারী হতে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত তিন মাসের যুদ্ধবিরতি পালনে উভয় পক্ষ সম্মত হয়। কিন্তু এই যুদ্ধবিরতির সুযোগে নতুন ক্যাম্প স্থাপন, সামরিক অভিযান ও টহলদান বৃদ্ধি করে সশস্ত্র বাহিনী বার বার যুদ্ধবিরতির সকল শর্ত লংঘন করে চলেছে। প্রথমতঃ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা রাঙ্গামাটি জেলার রাঙ্গামাটি সদর, কাউখালী, নানিয়ারচর, জুরাছড়ি, বরকল, লংগদু ও বাঘাইছড়ি থানা এবং খাগড়াছড়ি জেলার খাগড়াছড়ি সদর, মাটিরাঙ্গা, মহালছড়ি, পানছড়ি ও দিঘীনালা থানায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাপক সামরিক টহলদান বৃদ্ধি করেছে। এই টহলদানের সময় গ্রামগুলিতে ঘর-বাড়ী তল্লাসী ও জুম্ম গ্রামবাসীদেরকে বেদম মারপিট, নারীদের শ্লীলতাহানি, জোর পূর্বক গুচ্ছগ্রামে স্থানান্তর ও বিনামূল্যে ফলমূল মোরগ-মুরগী হরণ করে জুম্মদেরকে ব্যাপক হয়রানি করা হচ্ছে। এছাড়া সেনা সদস্যরা এ সময়ে বিভিন্ন জায়গায় শান্তিবাহিনীকে এ্যাম্বুশ ও শান্তিবাহিনীর হাইড আউট ও সামরিক অভিযান চালিয়েছে। এই অভিযানকালে অনেক স্থানে এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণসহ ৬ই নভেম্বর '৯২ হতে ২১শে জানুয়ারী '৯৩ পর্যন্ত শান্তিবাহিনী সদস্যদের উপর ১১ বার হামলা করা হয়। এসব হামলায় এযাবত ১ জন শান্তিবাহিনী নিহত, ২ জন ধৃত, ১ জন আহত, ২টা স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রসহ অনেক মূল্যবান দলিল ও ব্যবহার্য্য জিনিষপত্র হারায়।

আর যুদ্ধবিরতির সুযোগে সেনাবাহিনী নভেম্বর মাসে ৫টি সহ এযাবত ১৩টি নূতন ক্যাম্প স্থাপন করেছে। স্থাপিত ক্যাম্পগুলো হচ্ছে—প্রতিভা পাড়া ক্যাম্প (খাগড়াছড়ি), উল্টাছড়ি ক্যাম্প (মেরুং), চংড়াছড়ি ক্যাম্প (মেরুং), তাংগুম মুখ ক্যাম্প (বাঘাইছড়ি), জোরপ্যা পাড়া ক্যাম্প (নানিয়াচর), বাকছড়ি ক্যাম্প (নানিয়াচর), শুকনাছড়ি ক্যাম্প (লক্ষীছড়ি), মাউন্তুম ক্যাম্প (বাঘাইছড়ি), লিয়ানজয় পাড়া ক্যাম্প (বরকল), তিনটি পেরাছড়া মুখ ক্যাম্প (মেরুং), চোদগীছড়া ক্যাম্প (বাঘাইছড়ি), মানিক্যা কার্ব্বারী পাড়া ক্যাম্প (দিঘীনালা) ও লক্ষীছড়ি সাব জোন ক্যাম্প (লক্ষীছড়ি)।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সরকারও এযাবৎ যুদ্ধবিরতি লংঘনের জন্য শান্তিবাহিনীকে দায়ী করে আসছে। অনুরূপভাবে ১৫ই জানুয়ারীর ঘটনার জন্য শান্তিবাহিনীকে দায়ী করে খবর প্রচার করা হয়েছে। এভাবেই বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধবিরতি লংঘনকে অস্বীকার করে আসছে।

UNPO'র সাধারণ সম্মেলন
জনসংহতি সমিতির যোগদান

হেগ (নেদারল্যাণ্ড) ভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা Unrepresented Nations and Peoples Organisation-এর তৃতীয় সাধারণ সম্মেলন গত ১৯—২৪ জানুয়ারী হেগ শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এই সংস্থাটির নবম সদস্য। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের প্রফেসর গৌতম চাকমা আমন্ত্রণ পেয়ে এই সম্মেলনে যোগদান করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিসহ ৫টি মহাদেশের ১৩ কোটি জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্বকারী ৩৯টি সদস্য ও ১১টি সম্ভাব্য সদস্যের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেছেন। ৩৯টি সংস্থার প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিনিধিও পর্য্যবেক্ষক হিসেবে যোগদান করেছেন।

জনসংহতি সমিতির ইউরোপের মুখপাত্র ডক্টর রামেন্দু শেখর দেওয়ান এই সংস্থাটি গঠনের প্রথম পর্য্যায় থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা বিষয়ে এই সংস্থাটির সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ রেখে আসছেন। রাজা ত্রিদিব রায়ের কন্যা চন্দ্রা কালিন্দী রায় এই সংস্থাটির তথ্য ও আইন দপ্তরের পরিচালক। তিনি বিদেশে অবস্থান করে স্বজাতি জুম্মদের স্বপক্ষে আন্তর্জাতিক প্রচারাভিযানেও কাজ করছেন।

UNPO সংস্থাটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কার্য্যক্রম এতটা বাস্তবসম্মত যে, যার ফলে এটি অতি অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বের অধিকার হারা, অবহেলিত, ঔপনিবেশিক শাসনে জর্জরিত ও আন্দোলনরত জাতিসমূহের মুক্তির স্বপক্ষে এই সংস্থাটি কাজ করে যাচ্ছে, জনসংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণ এই UNPO ও তার সকল সদস্যদের সহানুভূতি এবং সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

সম্পাদনা, প্রকাশনা ও প্রচারণা : তথ্য ও প্রচার বিভাগ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি।